Downloaded from: justpaste.it/9jqo5

ঈদের আনন্দ কী ও কেন?

মোঃ মাকসুদ উল্লাহ

===
========

শ্রমের প্রতিদান শ্রমদাতার মনে এক অনাবিল সুখ-আনন্দ বয়ে আনে। সে আনন্দের সাথে কোন আনন্দেরই জুড়ি মিলে না । সে পরম আনন্দ লাভের পূর্বশর্ত শ্রম সংশ্লিষ্ট দায়িত্বটি যথারীতি সম্পাদিত হবার পরবর্তী মুহূর্তটিও দায়িত্ব পালনকারীর জন্যে কম আনন্দের বিষয় নয়। রমযানের দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনা শেষে ঈদের আনন্দটিও অনুরূপ। এটা যদিও রমযানের কৃচ্ছ্র সাধনাকারীর পুরস্কার প্রাপ্তির দিন নয় তবে তা পুরস্কার প্রাপ্তির পথে অনেক দূর অনুগমন। তেমনি অনেকটা নিশ্চয়তার আশ্বাস বৈ কি। একে সদ্য পরীক্ষা সমাপ্তকারী কোন ছাত্র-ছাত্রীর আনন্দের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জন্যে পরীক্ষার সুফল প্রাপ্তি এবং সে সুফলের সনদ দ্বারা জীবনমান উন্নতকারী উপযুক্ত পেশা লাভের আনন্দ ছাড়াও তার পরীক্ষা সমাপ্তির পরবর্তী মুহূর্তটিও তার জন্যে অশেষ আনন্দ বয়ে আনে।

তবে এক্ষেত্রে পার্থক্য এই যে, বৈষয়িক পরীক্ষাদাতা পরীক্ষায় ভালো করলে যেমন তার পাশ অবধারিত একজন রোযাদারের পরীক্ষা পাশের সুফল অবধারিত হলেও সেটি শর্তহীন নয়। অর্থাৎ জীবনের পরবর্তী দিনগুলোর বিভিন্ন পরীক্ষার স্তরগুলোও তাকে সাফল্যের সাথে অতিক্রম করে যেতে হবে। কেননা ক্ষণস্থায়ী বৈষয়িক জগতের পরীক্ষা সমাপ্তির মেয়াদ নির্ধারিত থাকে বিধায় তার ফলাফল শর্তাধীন করা বা ঝুলিয়ে রাখার কোন নিয়ম নেই, কিন্তু একজন রোযাদারের পরীক্ষা সমাপ্তির দিন শুধু রমযানের শেষ তারিখই নয় বরং তার পার্থিব জীবনের সর্বশেষ দিনটিই হচ্ছে তার পরীক্ষার সর্বশেষ তারিখ। সুতরাং রমযানের পারে, সিয়াম পরীক্ষায় সফল উত্তরণ একজন রোযাদারের জন্য আনন্দ বয়ে আনলেও তার প্রকৃত আনন্দ মূলতঃ সেদিনই নিশ্চিত হতে জীবনের পরবর্তী বিভিন্ন ধাপে যদি সে আল্লাহর নির্দেশ পালনের পরীক্ষায় নিজেকে উত্তীর্ণ করে তুলতে সক্ষম হয়। রোযা পালনের উদ্দেশ্যেও তাই বর্ণিত হয়েছে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে,

“হে ঈমাদারগণ রোযা পালনের বিধানকে তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ করা হল যেমন বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, এজন্যে যে, তোমরা তাকওয়া অর্জন করবে”। (বাক্বারাহঃ ১৮৩)

আল্লাহর পছন্দনীয় চরিত্র ও জীবন ধারা আত্মস্থ করার প্রশ্নে রোযার সাধনা বিরাট সহায়কের কাজ করে। রমযানের সিয়াম সাধনার দ্বারা মানুষকে ক্ষুধা পিপাসায় কষ্ট দিয়ে তার থেকে একটা ইবাদত আদায় করে নেয়াই আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। বরং যাতে তার জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে রমযানের অনুশীলন ও সাধনালব্ধ অভ্যাস দ্বারা সে মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্যে অটল ভূমিকা পালন করতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই তার প্রতিটি রোযা ফরজ করা হয়। কারণ এ বৈষয়িক জগতের দুঃখ-কষ্টের ভয় এবং ভোগের লালসা -এদুটি বিষয় দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানুষের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এ দু'টি ক্ষেত্রে এসেই মানুষ আল্লাহর দেয়া, সীমা লংঘন করে বসে।

রমযানের প্রশিক্ষণ সে সীমালংঘন প্রবণতা হতে বিরত হবার ব্যাপারে মানুষকে সাহায্য করে। বিশেষ করে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার উপর মানব সমাজে আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সে দায়িত্ব পালনে যেরূপ নৈতিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তার আবশ্যক, রমযানের সাধনা সে চারিত্রিক দৃঢ়তাই একজন রোযাদারের মধ্যে সৃষ্টি করে। সুতরাং রোযার অন্য লক্ষ যে, মুলতঃ রমযান শেষের পরবর্তী পর্যায়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে খোদায়ী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার দুরুহ দায়িত্ব পালনকে সহজ করে সে ব্যাপারে অধিক বলার অপেক্ষা রাখেনা। বস্তুতঃ এ দৃষ্টিকোণ থেকে রোযা পালনকারী এবং ঈদ উৎসবে যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে মহানবী (সঃ) ঘোষণা করেছেন,

"আজকের এদিন মুমিনের জন্যে যেমনি ঈদের দিন, তেমনি আল্লাহর অবাধ্যদের জন্যে ওয়ায়ীদের তথা হুমকির দিন।"

সারা রমযানের রোযা পালনের পর কেউ ঈদের খুশীর মধ্য দিয়ে পালনের আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে গেলে এবং পুনরায় গতানুগতিক জীবনের অনুসারী হলে আর রোযা পালনকে নিষ্ফলই ধরে নিতে হবে। হাদীসেও তাই প্রমাণ করে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ

" বহু রোযাদার এমন আছে যাদের রোযা দ্বারা অভুক্ত থাকা ছাড়া কিছুই অর্জিত হয়না এবং বহু রাত্রি জাগরণকারী (নামায আদায়কারী) এমন আছে যাদের রাত্রিজাগরণ দ্বারা বিনিদ্র থাকা ছাড়া কিছুই অর্জিত হয় না।"(নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)।

সুখ ও দুঃখের কোন মুহূর্তেই মুসলমান আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন থাকতে পারে না। তাই ঈদের আনন্দঘন মুহূর্তটিতেও এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। অন্যান্য জাতির নিছক বৈষয়িক আনন্দ অনুষ্ঠানের ন্যায় ঈদ অনুষ্ঠান পালিত হয় না। বরং তাতে আল্লাহর কাছে নতজানু এবং অবনত মস্তকে কাকুতি মিনতি সহকারে প্রার্থনা জানাতে হয়। আর স্তুতি ও প্রশস্তি বর্ণনা করতে হয়। রাব্বুল আলামীনের কাছে রোযা সহ প্রতিটি ইবাদত-বন্দেগী অনুমোদনে এবং অপরাধসমূহ ক্ষমা করার জন্যে দোয়া করতে হয়। ঈদ হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের সার্বজনীন আনন্দ উৎসব। কেউ কেউ নামায পড়েনা, বহু লোক রোযা রাখেনা, অনেকে হজ্জব্রত পালনে অক্ষম, অনেকে আবার যাকাত আদায়ে অসমর্থ। কিন্তু ঈদের আনন্দ সবার জন্যে সমান উপভোগ্য। কেউ আনন্দ করবে আর কেউ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে মুখ বেজার করে থাকবে ইসলাম সমাজের এ দৃশ্য দেখতে চায় না।

বস্তুতঃ প্রকৃত ইসলামী সমাজের ঐ পীড়াদায়ক দৃশ্যের সৃষ্টি হবার কথাও নয়। এ জন্যে খুশীর আনন্দকে সমভাবে সকলের উপভোগ্য করার উদ্দেশ্যে সামর্থহীন প্রতিটি মানুষের হাতে যাকাত, ছদকা ও দানের অর্থ তুলে দেয়ার জন্যে ইসলামে বিত্তবানদের নির্দেশ দিয়েছে। এই পর্যায়ে একটি হাদীসের বক্তব্য বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি একজনের পক্ষ থেকে এক "সা" (অর্থাৎ এক সের সাড়ে বারো ছটাক) পরিমাণ খেজুর বা আটা (প্রত্যেক অঞ্চলের প্রধান খাদ্য) দ্বারা ছদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেছেন এবং মানুষ ঈদের নামাজের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর দরিদ্রের প্রতি বিত্তবানের এ দান মোটেই অনুগ্রহ বা করুণা নয়। বরং ধনী গরীবকে অর্থদান করে মূলতঃ গরীবের অধিকারকেই তার হাতে তুলে দেয়। পবিত্র কুরআনে অনুরূপ বলা হয়েছেঃ

"এবং তাদের (ধনীদের) সম্পত্তিতে সাহায্যপ্রার্থী ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের অধিকার রয়েছে।" (সূরা জারিয়াতঃ ১৯)

ঈদের এই আনন্দের মধ্যে দিয়েও আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার থেকে তার রাহে অর্থ ব্যয়ের পরীক্ষা নিচ্ছেন। পুরো রমযানের কৃচ্ছ সাধনায় মানুষ সাম্য, মৈত্রী, সহানুভূতি ও আন্তরিক প্রশস্ততার যে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে ঈদের দিনে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সবল-দুর্বল, শাসক-শাসিত নির্বিশেষে পাশাপাশি এই জামাতে দাড়িয়ে একই ইমামের পেছনে নামাজ আদায়ের চোখ জুড়ানো পবিত্র দৃশ্য আর পরস্পর খাবার বিনিময় ও দরিদ্র অক্ষমদের খোঁজ খবর নেয়ার মধ্য দিয়ে সে প্রশিক্ষণেরই ফলশ্রুতি ফুটে ওঠে। তবে সেটা কেবল আনুষ্ঠানিক ও লোক দেখানো না হোক,বরং স্থায়ী হোক, অন্তরনিঃসৃত হোক। এটাই ইসলামের আদর্শ।

বস্তুতঃ এমনি মধুর পরিবেশটি সমাজে স্থায়ী করাই হচ্ছে ইসলামের চরম ও পরম লক্ষ। কিন্তু তা স্থায়ী হচ্ছে না। স্থায়ী থাকে না। আমাদের ঈদের দিনের কোলাকুলি, করমর্দনে প্রাণের উষ্ণতার অভাবই বোধ হয় এজন্যে দায়ী। অন্যান্য সম্মিলিত ইবাদতের যে মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, জামাতে ঈদের নামাজ আদায়ের পেছনেও সে একই মহৎ উদ্দেশ্য সক্রিয়। ঈদের জামাতে পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল শ্রেণীর মুসলমান উপস্থিত হয়। এ মহৎ পর্বে প্রত্যেকের পারস্পরিক মেলামেশা-সম্প্রীতি মুসলিম জাতীয় ঐক্যের বিরাট সহায়ক। এসব জামাত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকে পরিপূর্ণ ইসলামী আদর্শ অনুসরণের আহবান জানানোর বিরাট সুযোগ এনে দেয়। মুসলিম সমাজ আজ নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত।

নিজেদের ও অপর ভাইদের প্রতিটি সমস্যা ও জটিলতার গোড়ায় অনৈক্য ও অনৈতিকতার প্রাধান্য অধিক। মুসলমানদের প্রথম কেবলা আজও ইহুদীদের কবলে বরং তার উপর ইহুদীদের স্থায়ী দখল কায়েমের চেষ্টা চলেছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশ পরস্পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত। বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংসের জন্যে ইসলামের দুশমনরা ভিতর-বাইর উভয় দিক থেকে পাগল হয়ে লেগেছে। বসনিয়াহার্জেগোভিনা, কাশ্মীর ও ফিলিস্তীনে ইসলামের দুশমনরা ইতিহাসের নজিরবিহীন বর্বরতা চালাচ্ছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানসহ প্রায় সকল মুসলিম দেশগুলোকে ধ্বংস ও কোণঠাসা করার পাঁয়তারা চলছে। ঐক্যের অভাব এই সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলছে।

মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শিক্ষা আদর্শের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও অনুসরণ ছাড়া অনৈক্য এবং যাবতীয় দুর্বলতা ও অনৈতিকতা দূরীভূত করার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। মিল্লাতের অবণতির কারণ সমূহের ব্যাপারে মুসলমানদের সচেতন করা এবং আল্লাহ্-রাসূলের নির্দেশিত পথে এ সমস্যার সমাধান জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য ঈদ-সমাবেশসমূহ বিরাট মাধ্যম। অবশ্য নানা মত ও পথের মানুষদের এই খুশীর অনুষ্ঠানে প্রতিপাদ্য বিষয়কে নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গিতে যুক্তিগ্রাহ্য পন্থায় পেশ করা আবশ্যক বৈকি। আমাদের ঈদের দিনের খুশীকে সকল স্তরের মানুষের মনে সমভাবে বিতরণ এবং ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতির অনুভূতি সৃষ্টি সহায়ক করার জন্য সকল দায়িত্বশীলদের আন্তরিক ভাবে সচেষ্টা হওয়া কর্তব্য।